কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায়: রিসালাতের ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ২. ১২. ১. তাঁর মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক

কুরআন-হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যদের মতই মানুষ। আবার কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনেক মুজিযা, অলৌকিক কর্ম, ও অলৌকিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবিয়-তাবিতাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেননি। তাঁরা সর্বান্তকরণে সকল আয়াত ও হাদীসকে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন। তিনি মানুষ ছিলেন তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে মহান আল্লাহ তাকে অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে দুটি মতবাদ তৈরি হয়, যারা এক অর্থের আয়াত ও হাদীসকে অন্য অর্থের আয়াত ও হাদীসের বিপরীত বা সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করে এবং একটি অর্থকে বিশ্বাস করার নাম করে অন্য অর্থের সকল আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেয়।

প্রথম মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতকের মু'তাযিলা ও সমমনা ফিরকাসমূহের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং পরবর্তীকালে দার্শনিক ও আধুনিক যুগে কোনো কোনো পাশ্চাত্যপন্থী পন্ডিতের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলিকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর অলৌকিকত্ব বিষয় আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। তাদের আকীদার মূল এই যে, তিনি একান্তই অন্য সকলের মত মানুষ ছিলেন, তিনি কুরআন ছাড়া অন্য কোনো মুজিযা দেখান নি এবং তাঁর কোনো অলৌকিক বৈশিষ্ট্যও ছিল না। এ বিষয়ক যে সকল আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অমুক বা তমুক অর্থ রয়েছে। এভাবে তারা তাঁর মুজিযা বিষয়ক ও তাঁর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির এমন ব্যাখ্যা করেন যে তাতে প্রকৃত পক্ষে তা সবই অস্বীকার করা হয়।

অন্য মতটি অনেক পরে জন্মলাভ করে। ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুজিযা, অলৌকিক কর্ম ও অলৌকিক বৈশিষ্টাবলি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এগুলির ভিত্তিতে তারা তাঁরা বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। তাদের মতামতের মূল কথা এই যে, তিনি মূলত বাশার বা মানুষ ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি অলৌকিক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একান্তই রূপক অর্থে বা দাওয়াতের প্রয়োজনে তাকে মানুষ বলা হয়েছে। তার মানবত্ব ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীসগুলির অমুক বা তমুক অর্থ রয়েছে। এভাবে তারা তাঁর বাশারিয়্যাত বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করেন যে, সেগুলি মূলত সবই বাতিল হয়ে যায়।

আমরা এখানে এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি আলোচনা করব।

'বাশার' (بَشَرٌ) অর্থ মানুষ, মানুষগণ বা মানুষজাতি (man, human being, men, mankind)। কুরআন কারীমে প্রায় ৪০ স্থানে 'বাশার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই একই অর্থে। একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থেই শব্দটি

ব্যবহৃত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা দেখব যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাও‘আত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের প্রধান দাবি ছিল যে, নবীগণ তো ‘মানুষ’ মাত্র, এরা আল্লাহর নবী হতে পারেন না। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতেই চাইতেন তবে ফিরিশতা পাঠিয়ে দিতেন। যেহেতু এরা মানুষ সেহেতু এদের নুবুওয়াতের দাবি মিথ্যা। এদের কথার প্রতিবাদে নবীগণ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ‘আমরা তোমাদের মত মানুষ’ এ কথা ঠিক, তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ হলে আল্লাহর ওহী ও নুবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা যায় না। বরং আল্লাহ মানুষদের মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছ নবী বা রাসূল হিসেবে বেছে নেন এবং মানবত্বের সাথেই তাকে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও ওহী প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিষয়েও কুরআনে একথা বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘বাশার’ বা মানুষ। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ‘অন্যদের মত মানুষ’। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولا

‘‘এবং তারা বলে, ‘কখনই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূমি হতে একটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত করবেন। অথবা আপনার একটি খেজুরের ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে আপনি নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন। অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবেন, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করবেন। অথবা আপনার একটি অলংকৃত স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে। অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন, তবে আমরা আপনার আকাশ আরোহণে কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের (আসমান থেকে) একটি কিতাব অবতীর্ণ করবেন যা আমরা পাঠ করব।’ বল, ‘পবিত্র আমার প্রতিপালক (সুবহানাল্লাহ!)! আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ, একজন রাসূল। আর মানুষের কাছে যখন হেদায়েতের বানী আসে তখন তো তারা শুধু একথা বলে ঈমান আনয়ন করা থেকে বিরত থাকে যে, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?!’’[1]

অর্থাৎ কাফিরদের দাবি যে, আল্লাহর রাসূল হওয়ার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতার কিছু অংশ লাভ করা। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ জানালেন যে, রাসূল হওয়ার অর্থ আল্লাহর নিদের্শ অনুসারে প্রচারের দায়িত্ব লাভ, ক্ষমতা লাভ নয়; ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

‘‘বল: ‘আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা’বুদ (উপাস্য) একমাত্র একই মা’বুদ। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।’’[2]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

‘‘বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা’বুদ একমাত্র একই মা’বুদ। অতএব তোমরা তারই পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রর্থনা কর। যারা শির্কে লিপ্ত তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।’’[3]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার তাঁর উম্মতকে বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা তাঁর উম্মতরক জানিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে বারবার তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, তিনি একজন মানুষ।

এক হাদীসে নবী-পত্নী উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

‘‘আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে মানুষেরা আসে। বাদী ও বিবাদীর মধ্য থেকে একজন হয়ত অধিকতর বাকপটু হয়, ফলে তাকে সত্যবাদী মনে করে হয়ত আমি তার পক্ষেই বিচার করি। যদি আমি ভুল করে একের সম্পদ অন্যের পক্ষে বিচার করে দিই, তবে সে সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না। বরং তা হবে তার জন্য আগুনের একটি পিন্ড, তার ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক, আর ইচ্ছা হলে তা পরিত্যাগ করুক।’’[4]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে ভুল করেন। সালামের পরে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতের কি কোনো নতুন বিধান নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন: তোমরা এ প্রশ্ন করছ কেন? তারা বলেন: আপনি এমন এমন করেছেন। তখন তিনি সালাত পূর্ণ করেন এবং বলেন:

إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

‘‘সালাতের নিয়ম পরিবর্তন করা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যেমন ভুল কর আমিও তেমনি ভুল করি। যদি আমি কখনো ভুল করি তবে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দেবে।’’[5]

রাফি ইবনু খাদীজ (রা) বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আসলেন তখন মদীনার মুসলমানেরা খেজুরের মাওসুমের শুরুতে পুরুষ খেজুরের রেণুর সাথে স্ত্রী খেজুরের রেণু মেলাতেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন: আমরা সবসময় এভাবে করে আসছি। তিনি বলেন: এ না করলেই বোধহয় ভাল হবে। তখন তারা তা ত্যাগ করেন, ফলে সে বৎসর খেজুরের উৎপাদন কম হয়। তখন তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়। তিনি বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

‘‘আমি তো একজন মানুষ মাত্র। যখন আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দান করব, তখন তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি আমি কোনো জাগতিক বিষয়ে আমার ধারণা বা মতামত বলি তবে তো আমি একজন

মানুষ মাত্র।’’[6]

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন:

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) رَجُلانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

‘‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে দু’জন লোক আসেন। তারা কি বলেন আমি জানি না, তবে তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাগান্বিত হন। তিনি তাদেরকে গালি দেন এবং বদ দোয়া করেন। তারা বেরিয়ে গেলে আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এই দুইজন লোক কখনো কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন: কেন? আমি বললাম: কারণ আপনি তাদেরকে গালি দিয়েছেন এবং বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন: তুমি কি জান না আমার প্রতিপালকের সাথে আমার কি চুক্তি হয়েছে? আমি তো আল্লাহকে বলেছি: ‘হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তাই যদি কোনো মুসলিমকে আমি কখনো বদদোয়া করি বা গালি দিই, তাহলে আপনি তা সেই ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা ও সওয়াব বানিয়ে দেবেন।’’[7]

উপরের অর্থে আবূ হুরাইরা, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আনাস ইবনু মালিক, আবু বাক্রাহ ও অন্যান্য সাহাবী () থেকে অনেক হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এ সকল আয়াত ও হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনেক মুজিযা ও বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা ও অন্যান্য মুজিযা বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে অনেক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন যা কোনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। এগুলিকে আরবীতে ‘খাসাইস’ বা ‘বৈশিষ্ট্যসমূহ’ বলা হয। ইতোপূর্বে তার মর্যাদা বিষয়ক হাদীসগুলিতে তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ যেভাবে সামনের দিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুসমূহ দেখে তিনি অনুরূপভাবে পিছনদিকেও দেখতেন[8], তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকত[9], সাধারণ মানুষের মত তার শরীরে ঘামে কোনো দুর্গন্ধ ছিলনা, বরং তার শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধ, সাহাবীগণ যা আতর হিসেবে ব্যবহার করতে অতীব আগ্রহী ছিলেন।[10] এ ছাড়া আরো অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মহান মর্যাদার একটি দিক যে, মহান আল্লাহ তাকে ‘সিরাজুম মুনীর’: ‘জ্যোতির্ময় প্রদীপ’ বা ‘নূর-প্রদানকারী প্রদীপ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

‘‘হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং আলোকোজ্জ্বল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে।’’[11]

আমরা কুরআন কারীমের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনায় দেখব যে, মহান আল্লাহ বারংবার কুরআন কারীমকে ‘নূর’ বা জ্যোতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোনো কোনো স্থানে মহান আল্লাহ সাধারণভাবে ‘নূর’ বা ‘আল্লাহর নূর’ এর কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুফাস্সিরগণ মতভেদ

করেছেন। আল্লাহ বলেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

‘‘তারা ‘আল্লাহর নূর’ ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ ‘তাঁর নূর’ পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।’’[12]

এখানে ‘আল্লাহর নূর’ বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন:

এখানে ‘আল্লাহর নূরের’ ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে: (১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। ইবনু আববাস ও ইবনু যাইদ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায়। সুদ্দী এ কথা বলেছেন। (৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ), কাফিররা অপপ্রচার ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তার ধ্বংস চায়। দাহ্হাক এ কথা বলেছেন। (৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলি অস্বীকার করে মিটিয়ে দিতে চায়। ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন। (৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য। অর্থাৎ ফুৎকারে সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত। ইবনু ঈসা এ কথা বলেছেন।[13]

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভিন্ন আয়াতে ‘নূর’ বা ‘আল্লাহর নূর’ বলা হয়েছে এবং সেখানে নূর অর্থ ‘কুরআন’, ‘ইসলাম’ ‘মুহাম্মাদ (ﷺ)’ ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেছেন মুফাস্সিরগণ[14]। এরূপ এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

‘‘হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।’’[15]

এই আয়াতে ‘নূর’ বা জ্যোতি বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এখানে নূর অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)।[16]

এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। যারা ‘নূর’ অর্থ ইসলাম বলেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এই আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা বলা হয়েছে এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ ছাড়া কুরআন কারীমে অনেক স্থানে ‘নূর’ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।[17]

যারা এখানে নূর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এই আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু শেষে ‘নূর’ ও ‘স্পষ্ট কিতাব’ বলতে ‘কুরআন কারীমকে’ বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এভাবে কুরআন কারীমকে ‘নূর’ বলা হয়েছে এবং ‘স্পষ্ট কিতাব’ বলা হয়েছে। এখানে দুটি বিশেষণ একত্রিত করা হয়েছে।[18]

যারা এখানে ‘নূর’ অর্থ ‘মুহাম্মাদ (ﷺ) বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, ‘স্পষ্ট কিতাব’ বলতে কুরআনকে বুঝানো

হয়েছে। কাজেই 'নূর' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)– কে বুঝানোই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইমাম তাবারী বলেন,

يعني بالنور محمدا (ﷺ) الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب.

''নূর (আলো) বলতে এখানে 'মুহাম্মাদ (ﷺ)–কে বুঝানো হয়েছে, যাঁর দ্বারা আল্লাহ হক্ক বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শির্ককে মিটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আলোকিত হতে চায় তার জন্য তিনি আলো। তিনি হক্ক বা সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর হক্ককে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহূদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন করত তার অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন।''[19]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কারীমে সত্যের দিশারী, হেদায়াতের আলো ও সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কুরআন কারীমের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা নূর থেকে সৃষ্ট। আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্ট, জড় বা মূর্ত নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ইসলাম ও কুরআন কোনো জাগতিক, 'জড়', ইন্দ্রিয়গাহ্য বা মূর্ত 'আলো' নয়। এ হলো বিমূর্ত, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা মানুষের হৃদয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে।

কিন্তু ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন বা মাটির মানুষ নন; রবং প্রকৃতপক্ষে তিনি নূর এবং নূরেরই তৈরি। এরপর কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেন, যদি কেউ তাঁর নূর থেকে তৈরি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বা তাকে মানুষ বলে বা মাটির মানুষ বলে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। তাঁরা উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্যকে তাদের দাবির পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এছাড়া আরো দু প্রকারের দলিল তারা পেশ করেন:

(১) নূর-মুহাম্মাদী (ﷺ) বিষয়ক 'হাদীস' নামে প্রচারিত কিছ কথা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে আল্লাহ 'নূর' থেকে বা 'আল্লাহর নূর' থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থে প্রচারিত কিছু সনদ-বিহীন ভিত্তিহীন বা জাল বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করা হয়। যেমন বলা হয় যে, জাবির (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَوَّلُ مَا خَـلَـقَ اللهُ نُـوْرَ نَبِيِّـك مِـنْ نُـوْرِهِ....

''সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন।''

এরপর এই লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।....

হাদীস নামে কথিত এ কথাগুলি কোনো একটি হাদীসের গ্রন্থেও সনদ-সহ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ছয়টি

হাদীসগ্রন্থ, বা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ তো দূরের কথা পরবর্তী যুগগুলিতে সংকলিত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলন-গ্রন্থগুলিতেও এর কোনো উল্লেখ নেই। সপ্তম হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস বা সীরাতের গ্রন্থে এর সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় না। ‘‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’’ গ্রন্থে আমরা দেখেছি যে, দশম-একাদশ হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি আব্দুর রায্যাক সান‘আনী তার মুসান্নাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, বাইহাকী তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ দু আলিমের কোনো গ্রন্থের কোথাও এ হাদীসটির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম সুয়ূতী স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য।[20]

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ আরবীয় সূফী গবেষক মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু সিদ্দীক আল-গুমারী সুয়ূতীর এ কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, সুয়ূতী এ হাদীসটিকে ‘অনির্ভরযোগ্য’ বলে এর অবস্থা সঠিকভাবে জানাতে পারেন নি, বরং তাঁর বলা দরকার ছিল যে, ‘হাদীসটি সন্দেহাতীতভাবে জাল’। তিনি বলেন: ‘‘ইমাম সুয়ূতীর এ কথাটি আপত্তিকর অবহেলা। বরং হাদীসটি সুস্পষ্টতই জাল বা বানোয়াট। এর ভাষা ও অর্থ আপত্তিকর। হাদীসটি আব্দুর রায্যাক উদ্ধৃত করেছেন বলে সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন। অথচ আব্দুর রায্যাক সান‘আনী রচিত ‘আল-মুসান্নাফ’, ‘তাফসীর’ এবং ‘আল-জামি’ কোনো গ্রন্থেই হাদীসটির অস্তিত্ব নেই। এর চেয়েও অবাক বিষয় মরোক্কোর শানকীত এলাকার কোনো কোনো আলিম আব্দুর রায্যাকের নামে আব্দুর রায্যাক থেকে জাবির পর্যন্ত এর একটি সনদও বানিয়েছেন। আল্লাহ জানেন যে, এ সবই ভিত্তিহীন কথা। জাবির (রা) কখনোই এ হাদীস বর্ণনা করেননি এবং আব্দুর রায্যাকও এ হাদীসটি কখনো শুনেন নি। প্রথম যে ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করেন তিনি হলেন ইবনু আরাবী হাতিমী (৬৩৮ হি)। ... আমি জানি না তিনি কোথা থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই কোনো সূফী দরবেশ হাদীসটি বানিয়েছে।’’[21]

এ ‘হাদীস’ এবং ‘নূর মুহাম্মাদী’ বিষয়ক অন্যান্য ‘হাদীস’-এর সনদের অবস্থা আমি ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে কোনো বিবেকবান আলিম স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নূর দ্বারা তৈরি বিষয়ক একটি হাদীসও কোনো সহীহ বা হাসান সনদ তো দূরের কথা আলোচনা করার মত যয়ীফ সনদেও বর্ণিত হয় নি। হাদীসের কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত সবই হয় সনদবিহীন প্রচলিত কথা অথবা মুহাদ্দিসগনের ঐকমত্যে জাল ও বানোয়াট কথা।

(২) এ বিষয়ে গত কয়েক শতাব্দীর কোনো কোনো আলিমের মত

এ বিষয়ে হাদীস নামে কথিত কথাগুলি ইসলামের প্রথম ৫/৬ শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ হাদীস বলে কথিত বক্তব্যগুলি প্রচারিত হওয়ার পরে অনেক আলিম এগুলির সনদ সম্পর্কে খোঁজাখুজি না করে সাধারণভাবে এগুলির কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সকল ব্যাখ্যা বা মতামতকে এ মতের স্বপক্ষে ‘দলিল’ হিসেবে পেশ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূর থেকে সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে এ বিতর্কটি একেবারেই কৃত্রিমভাবে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইসলামের প্রথম অর্ধ-সহস্র বৎসর যাবৎ বিষয়টি আকীদার অন্তর্ভূক্ত হওয়া তো দূরের কথা মুসলিম উম্মাহর সাধারণ আলোচনার বিষয়ও ছিল না। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে আল্লাহর ‘‘আব্দ’’ বা বান্দা হিসাবে বিশ্বাস করা এবং সাক্ষ্য দেওয়া

রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ‘আল্লাহর বান্দা’ বলতে মানুষকে বুঝানো হয়। তাই এই বিশ্বাসের সরল অর্থ এই যে, তিনি মানুষদেরই একজন। তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তবে তিনি মানবতার ঊর্ধ্বে উঠেন নি।

(২) কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তাঁর আবদিয়্যাত (দাসত্ব) ও বাশারিয়্যাত (মানবত্ব)-এর কথা বারংবার সুস্পষ্টরূপে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলনু ‘আমি নূর’। কোথাও বলা হয় নি যে, ‘মুহাম্মাদ নূর’। শুধু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, তোমাদের কাছে ‘নূর’ এসেছে বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাস্সির একথা বলেছেন।

(৩) কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের ঊর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম। সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা। পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেওয়া। আব্দিয়্যারেত ও বাশারিয়্যাতের ওজুহাতে মুজিযা ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি। অনুরূপভাবে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত-হাদীস বা এ বিষযক বানোয়াট কথা বা আলিমদের মতামতের ভিত্তিতে আবদিয়্যাত বা বাশারিয়্যাত অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা বা কুরআন-হাদীসে যে কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি সে কথাকে বিশ্বাসের অংশ বানানোও অনুরূপ বিভ্রান্তি।

(৪) এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের কাছে আতমসমর্পণ করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী তা পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারছেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব। আর মুফাস্সিরদের কথাকে তার স্থানেই রাখব।

আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে আমরা ‘কুরআন’-কে বুঝাবো। কারণ কুরআনে স্পষ্টত ‘কুরআন’কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে স্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তাঁর বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। তবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মানব জাতির পথ প্রদর্শনের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাঁকে নূর বলা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে যে, তাঁর মধ্যে নুবুওয়াতের নূর বিদ্যমান ছিল।

(৫) কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি ‘হাকীকতে’ বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজাযী বা রূপক অর্থেই তাঁকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্ব্যর্থহীন বাণী নেই।

(৬) ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–নূরের তৈরি’ বলে বিশ্বাস করাকে ঈমানের অংশ বানানো, অথবা এ কথা অস্বীকার করাকে কুফরী বলে গণ্য করা নিঃসন্দেহে পূর্ববতী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করা। যে কথা কুরআনে সুস্পষ্টত

বলা হয় নি, যে কথা স্পষ্টভাবে কোনো মুতাওয়াতির হাদীস তো দূরের কথা কোনো সহীহ হাদীসেও বলা হয় নি, সে কথাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার ভিত্তিতে সকল সুস্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করা এবং কুফরী ফাতওয়া দেওয়া বিভ্রান্ত সম্প্রদায়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আমরা দেখব, ইনশা আল্লাহ।

(৭) বস্তুত নূরের তৈরি হওয়ার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা আছে বলে মনে করাই ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। সৃষ্টির মর্যাদা তার সৃষ্টির উপাদানে নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদায় এবং তার নিজের কর্মে। এজন্যই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিম নূরের তৈরি ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরি মানুষকে অধিক মর্যাদাশালী বলে গণ্য করেছেন।

এভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতিতে তিনি অন্য সবার মতই মানুষ। তার মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান কর্মে ও তাঁর মহোত্তম চরিত্রে। উপাদানে, সৃষ্টিত প্রকৃতিতে অন্য সবার মত হয়েও যে তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসায় ও ইবাদতে অবিচল, অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন, তাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব ছাড়াও অনেক অলৌকিক বা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে তাঁর যে সকল অতিমানবীয় বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন। এর বাইরে কোনো অতিমানবীয় গুণাবলী তারা তাঁর প্রতি আরোপ করেন না। তারা বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে কথা যতটুকু বলা হয়েছে সে কথা ততটুকু বললেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করা হয়। মানবীয় যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিয়ে অতিরিক্ত কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

ফুটনোট

[1] সূরা (১৭) ইসরা (বনী ইসরাঈল): ৯০-৯৪ আয়াত।

[2] সূরা (১৮) কাহাফ: ১১০ আয়াত।

[3] সূরা (৪১) ফুস্সিলাতত (হা মি আস সাজদা): ৬ আয়াত।

[4] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৬৭, ৬/২৫৫৫, ২৬২২, ২৬২৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৩৭-১৩৩৮; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৫/১০৭, ২৮৮, ১২/৩৩৯, ১৩/১৫৭, ১৭২, ১৭৮।

[5] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৫৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪০০; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৫০৩-৫০৪।

[6] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৩৫-১৩৮৬।

[7] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০০৭।

[8] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬২, ২৫৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২০, ৩২৪।

[9] বুখারী, আস-সহীহ ১/৬৪, ২৯৩, ৩/১৩০৮; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২৮; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/২৩৮, ২/৩৪৪, ১৩/২৪৯, ৪৭৮।

[10] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮১৫।

[11] সূরা (৩৩) আহযাব, ৪৫-৪৬ আয়াত।

[12] সূরা (৬১) সাফ, ৮ আয়াত। পুনশ্চ, সূরা (৯) তাওবা, ৩২ আয়াত।

[13] কুরতুবী, তাফসীর ১৮/৮৫।

[14] দেখুন: সূরা ২: বাকারা, ২৫৭ আয়াত, সূরা ৪: নিসা, ১৭৪ আয়াত, সূরা ৫: মায়েদা, ১৬ আয়াত, সূরা ৬: আল-আন‘আম, ১২২ আয়াত, সূরা ১৪ : ইবরাহীম, ৫ আয়াত, সূরা ৩৩: আহযাব, ৪৩ আয়াত, সূরা ৫৭: হাদীস, ২৮ আয়াত ...।

[15] সূরা (৫) মায়েদা, ১৫ আয়াত।

[16] তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১; কুরতুবী, তাফসীর ৬/১১৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।

[17] ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২১৯।

[18] ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।

[19] তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১।

[20] সুয়ূতী, আল-হাবী ১/৩৮৪-৩৮৬।

[21] ড. যাকারিয়া, আশ-শিরক ২/৮৮২।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13636

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন